ধুলো

প্রণব নিজের স্টপে নামতে যাচ্ছে, মোটা মতো এক মহিলা তার পা মাড়িয়ে বাসে উঠতে উঠতে তাকেই শুনিয়ে দিলেন, যত ভিড়— সব গেটে, আশ্চর্য।

প্রণবের মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল, কিন্তু বাস থেকে নেমেই তার প্রধান কাজ মাটিতে পা ঠোকা। ফুটপাতের শানে সে ছ-সাতবার ঠপ-ঠপ করে পা ঠুকে-ঠুকে চটির ধুলো ঝাড়ল। তারপর তিন আঙুলে পাঞ্জাবির বুকের কাছটা ধরে খুব করে নেড়ে দিল। তারপর ধুতির কোচা ঝাড়ল। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ ঘাড় গলা ঘষে ঘষে মুছে রুমালটা গুনে গুনে ঠিক পাঁচবার ঝেড়ে পকেটে রেখে সে ভাবল, এই সব অবিচারের প্রতিকার কী? গেটে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছিলাম নাকি!

বাজার পেরিয়ে তার বাড়ির গলি। বাজার মানে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িপাল্লা আর আলু-কুমড়ো নিয়ে বসে যাওয়া। একটা লরি আসছে দেখে প্রণব পিছন ফিরে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে পড়ল। যা ধুলো ওড়ায়!

গলির মুখে পৌঁছেই বছরের প্রথম কালবৈশাখী। কাঁকর মুখে এসে বিঁধছে। দুহাতে চোখ ঢেকে প্রণব সিঁটিয়ে রইল। বাড়ি গিয়ে প্রথমেই ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ধুতি পাঞ্জাবি ঝাড়া তার রোজকার অভ্যেস। আজ প্রায় পাঁচ মিনিট সে জামা-কাপড় ঝাড়ল। তারপর সোজা বাথরুমে। কানে আঙুল ঢুকিয়ে চোখের সামনে নিয়ে দেখল, আঙুলে ধুলো। চৌবাচ্চায় জল নীচে গিয়ে ঠেকেছে। ঝুঁকে আঙুল ভিজিয়ে ভিজিয়ে নাক পরিষ্কার করল। চুলে মাথায় ভিজে হাত চালিয়ে সে প্রাণপণে নিজেকে ধুলোমুক্ত করে ঘরে ঢুকে দেখল, রমা নেই। পাশের বাড়িতে জোরে রেডিও চালিয়েছে, প্রণব গলা তুলে ডাকল, নির্মলা!

সেই যে দরজা খুলে দিয়ে কোথায় সেঁধিয়েছে, সাড়া নেই। আবার চ্যাঁচায় নির্মলা! তুই কি বাড়ি আছিস, না নেই?

নির্মলা হালুয়া আর চা নিয়ে ঘরে ঢোকে, চা এখানে দেব, না বারান্দায় খাবে?

—সেই কখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাস না? তোর বৌদি কোথায় গেছে জানিস?

—বিকেলে বেরিয়েছে। আমি বাথরুমে কাপড় কাচ্ছিলাম। বলে গেল, ফিরতে দেরি হলে তোমাকে হালুয়া করে দিতে।

—নর্দমায় ফেলে দে!

নির্মলা জানে, এসব রাগ গায়ে মাখতে নেই। টেবিলের ওপর বউদির ছাড়া জামা-কাপড়, কালকুট্টি ব্রেসিয়ার। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে একহাতে ওগুলো সরিয়ে দিল। তারপর প্লেটটা রেখে বেরিয়ে গেল।

—শোন! ঝড়ের সময় রান্নাঘরের জানলা বন্ধ করেছিলি?

—না তো।

—ও, তবে তো ভালোই! একেবারে ধুলোর হালুয়া বানালেই পারতে! সুজি বেঁচে যেত।

রাগের মধ্যেই এক চামচ মুখে দিয়ে থু-থু করে ফেলে দেয়, ইশ! ধুলো কিচকিচ করছে।

—ও চিনির বালি। র‍্যাশনে এবার যা ময়লা চিনি দিয়েছে।

পাঁচ মিনিটের ঝড় কখন থেমে গেছে, চারদিকে শুধু ধুলোর গন্ধ। একা ঘরে চা খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে প্রণব নিরুপায় পায়চারি করে। জানলা দিয়ে ধুলোর গন্ধ নাকে লাগছে। বাসের ভিড়, ঝড়ে পড়ে দুপুরের অপমান সে এতক্ষণ ভুলে ছিল, ধুলোর গন্ধে পারচেজের দিলীপ কুণ্ডুকে মনে পড়ে গিয়ে তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। শীত গ্রীষ্ম বারো মাস চওড়া টাই পরা কুণ্ডুসাহেবের সামনে নিজেকে সে এখন দারুণ শক্তিশালী কল্পনা করল। নেতাজি বা ওইরকম কারও মতো। অপমানে তার বুকের মধ্যেটা জ্বলছে। পায়চারি করতে করতে প্রণব দাঁত চেপে উচ্চারণ করল, শুয়োরের বাচ্চা!

রমা ফিরল ঠিক নটায়। ঘরে ঢুকেই ধপ করে বসে পড়ল। পা মাটিতে, কোমর থেকে শরীরটা ভেঙে সাবধানে বিছানায় উপুড় হয়ে হাত দিয়ে কপাল টিপে রেখেছে। মুখ না তুলেই বলল, কখন ফিরেছ?

প্রণব সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকে। সাড়া না পেয়ে রমা মাথা তুলে ভুরু কোঁচকায়, তার চোখ হালুয়ার প্লেটে, একি, খাওনি?

— তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

— ডাক্তারের কাছে।

— আজ যাবার কথা ছিল?

— না, বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলুম, খুব একটা লাগেনি, কিন্তু খুব ভয় হল, পেটে একটা চিনচিনে ব্যথাও হচ্ছিল—

— একা গিয়েছিলে?

— আর কে আছে, কাকে নিয়ে যাব?

একেকবার রাগের সময় নিজের বোনের নাম প্রণবের কিছুতেই মনে পড়ে না, একটু সেকেলে, সাধুভাষা-ঘেঁসা, শুধু এইটুকু তার মনে থাকে, ছোট কোনও ডাকনামও নেই, কখনও কল্যাণী, কখনও অপর্ণা, যখন যেটা মনে আসে নিঃসংশয়ে বলে দেয়। সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল, শ্যামলীকে নিয়ে যেতে পারতে।

— তুমি ফিরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে?

— আমার জন্যই না হয় অপেক্ষা করতে!

— কবে তুমি গেছ? একবারও তুমি নিজে আমাকে ভালো কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছ?

বিরক্তিতে উঃ বলে রমা মাথা নামায়। দু দিকের রগ টিপে ধরেছে।

— ওপর-ওপর দেখল, না শাড়িটাড়ি...

রমা মুখ তুলল না। তাতে প্রণবের রাগ আরও বেড়ে গেল। চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ে সে আবার পায়চারি করতে লাগল। তার গলা প্রায় গরগর করে উঠল, তোমরা মেয়েরা পারোও বটে।

দশ মিনিট পরে রমা উঠল। রান্নাঘর থেকে ঘুরে এসে হালুয়ার প্লেটটা অল্প একটু ঠেলে দিয়ে খুব আস্তে বলল, খাবার দেরি আছে, এটা খেয়ে নাও।

প্রণব তার পিঠের কাছেই দাঁড়িয়ে পড়ে, ওই ধুলোর পিণ্ডি আমি খাব না।

রমা হঠাৎ ঝেঁজে ওঠে, সারাজীবন ধুলো-ধুলো করেই গেলে!

প্রণব প্রায় ভেংচায়, না— ধুলো জিব দিয়ে চাটব, ধুলোয় চিতিয়ে থাকব! শুধু মুখে সাবান মাখলেই হল, না?

ধুলোর খোঁটায় তার মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। ছিয়াশি লক্ষ সত্তর হাজার তিনশো এগারো টাকা উনিশ পয়সার হিসেব মেলাতে আটত্রিশ পয়সার গোলমাল কার না হতে পারে তাও যদি অ্যাডিং মেশিন থাকত! এই সামান্য ভুলের জন্য ব্যাটা কুণ্ডু তাকে এক ঘর লোকের সামনে বলতে পারল, অ্যাকাউন্টস ছেড়ে সুইপারের কাজ করলেই আপনাকে ঠিকমতো মানায়। সারাদিন তো দেখি শুধু ধুলোই ঝাড়ছেন।

তার টেবিল সে দুবার ছেড়ে দুশো বার পরিষ্কার করবে, তোর বাপের কীরে শালা! মানুষের নাকে-মুখে ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চড়ে বেড়ালেই তুমি কিছু মানুষের বাচ্চা হয়ে যাও না। কর্তাদের জুতোর ধুলো চেটে ওরকম অফিসার সবাই হতে পারে।

প্রণব ঘর ছেড়ে অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করছিল, রমাকে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরের দিকে যেতে দেখে বলল, ঘরে নার্স-টার্স কেউ ছিল, না ডাক্তার একাই সব দেখল?

রমা রাগে ছটফট করে ঘরে ঢুকে গেল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে কুঁজো থেকে গেলাসে জল ঢালতে ঢালতে নির্মলাকে বলল, আমি খাব না। রান্না হলে তোর দাদাকে খেতে দিয়ে তুই খেয়ে নিস।

ঢকঢক করে জল খেয়ে ঘরে ফিরে আলো নিবিয়ে দিল।

প্রণবের তখন আরও রেগে উঠতে ইচ্ছে করছে। রাগে ফেটে পড়তে পারলে বাঁচা যায়। রেডিওয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরোধের আসর হচ্ছে। তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে। মাথায় রাগ নিয়েই সে গানটার দুয়েক কলি শুনল। এইসব গান এখানে মানায় না। কলকাতা একটা বিষাক্ত শহর। এর হাওয়ায় রাশি রাশি ধুলো। সেঁকো বিষ!

খুট করে আলো জ্বলে উঠল। নির্মলা টান-টান করে চুল বেঁধেছে, মুখে ঘাম। শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে বলল, তোমার খাবার দিই?

— ফের শাড়িতে হাত মুছছিস? যা, আগে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আয়।

আরও ছ-সাত বার বারান্দার এমাথা-ওমাথা করে প্রণব ক্লান্ত হয়ে ভাবল এত রাগ নিয়ে মানুষ বাঁচে! রোজ সেই রাগ আর জ্বালা আর ক্লান্তি। সেই ধুলো আর অপমান। বারো মাস তিরিশ দিন ঠিক এক ছকে জীবন বয়ে চলেছে।

বারান্দার ওমাথায় পৌঁছে এই প্রথম তার তারা ভরা আকাশ চোখে পড়ল।

অন্যমনস্কভাবে এক পলক তাকিয়ে প্রণব গা-ঝাড়া দেবার চেষ্টা করল, না, আর এই তিতিবিরক্ত দিন কাটানো নয়, কালই একটা হিন্দি ফিল্ম দেখতে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে এবার থেকে রোজ সে ব্রিজ খেলবে। ফ্ল্যাশ খেলে পয়সা করতে পারলে আরও ভালো। রমার জন্য ছোটখাটো একটা নার্সিং হোমের ব্যবস্থা করা যায় না? কত টাকা লাগে? অফিসে লোন পাওয়া যাবে না? হাতে চার মাস সময়।

রেডিওয় তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় শুনে প্রণব খুব শান্ত হয়ে ভাবল, সে অন্য ধুলো। কলকাতার ধুলোয় রবীন্দ্রনাথ একেবারে বেমানান। এই শহরে এখনও যে মানুষ জন্মায় সেটাই আশ্চর্যের।

ভেজানো দরজা ঠেলে প্রণব ঘরে ঢুকল। অন্ধকার। চোখ সয়ে আসতে দেখল, রমা নিজের জায়গায় শুয়ে আছে। অন্ধকারেই সে রমার কপালে হাত রেখে আস্তে করে ডাকল, রমা।

সাড়া নেই।

— রমা! ওঠো! খাবে না? রমা, ও রমা—

রমা ঘুম ভেঙে উঃ করে উঠল, জড়ানো গলায় বলল, আমাকে একটু ঘুমোতে দাও।

— দেব, দেব। বলে হঠাৎ সে রমার কপালে চুমু দিল। তারপর দুহাতে তার মাথাটা ধরে কপালে গালে নাকে গলায় পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল।

— আঃ! কী করো, ছাড়ো!

গলার স্বরে প্রণব মাথা ছেড়ে দিয়ে স্থির হয়ে গেল। খানিক ওইরকম বসে থেকে বলল, ডাক্তার কী বলল? কোনও ড্যামেজ হয়নি তো?

রমা বাহুতে চোখ ঢেকে ছিল, হাত না সরিয়েই বলল, হলে তো বেঁচে যেতাম।

— সে কী! তুমি ছেলে চাও না?

রমা চুপ করে রইল। প্রণব পুরোপুরি বিষণ্ণ গলায় বলল, রমা, রাগ করে থেকো না। সারাদিন আমি একটা খ্যাপা কুকুর হয়ে ঘুরে বেড়াই। তারপর তুমিও যদি—

ছেলেবেলা থেকেই প্রণবের অভ্যেস, বাক্য শুরু করলে শেষ করবেই। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে তার সেই

ক্ষমতা কমে আসছে জেনেও সে এখনও খুব চেষ্টা করে। আজ কথা শেষ না করে আস্তে উঠে গিয়ে চেয়ারে বসল। হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালিয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল।

চোখে আলো লাগতে রমা দেওয়ালের দিকে ফিরে শুলো।

পিছন ফিরে তার শুয়ে থাকার ভঙ্গিটি ভারি সুন্দর। ঢেউয়ের মতো গড়ন। হাঁটু মুড়ে শুয়েছে। প্রণব সিগারেট খেতে খেতে আলগাভাবে চেয়ে থাকে। পায়ের কাছে শাড়ি উঠে গেছে, এক পায়ের গোছ দেখা যায়। হঠাৎ তার চোখ জ্বলে ওঠে। বাইরের শাড়ি বদলেছে, শায়া পালটায়নি। লেসের কাছটা ধুলোয় কালো হয়ে আছে।

প্রণব রাগ চাপবার চেষ্টা করে, একী, রাস্তার শায়া নিয়ে বিছানায় উঠেছ!

রমা হয়তো ঘুমিয়ে গেছে, কিংবা ইচ্ছে করেই সাড়া দিল না।

প্রণব প্রাণপণে রাগ চাপে, রমা, ওঠো শায়াটা ছেড়ে ফ্যালো। রাস্তার ধুলো একেবারে কামড়ে বসেছে।

রমা নড়ল না। প্রণব একলাফে বিছানার কাছে এসে গর্জন করে উঠল, ওঠো, ওঠো বলছি! বিছানায় রাস্তার কাঁচা ধুলো লেপে না দিলে মন ভরে না, না? প্রণব মারবে বলে হাত তোলে।

রমা ঝটকা দিয়ে উঠে বসে বিছানা ছেড়ে ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে।

শাদা চাদরে চোখ রেখে প্রণব গজগজ করে, আর কদিন পর এখানে একটা বাচ্চা শোবে, সেটা পর্যন্ত খেয়াল থাকে না। এমনিতেই ধুলো বাঁচিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব, শহরময় শুধু ধুলো আর ধুলো, একেবারে সেঁকোবিষ!

রমা ঘরের কোণ থেকে ফুঁসে ওঠে, ওই ধুলো ধুলো করেই মরো! বাচ্চা শোবে! কী খাওয়াবে তার ঠিক নেই, একটা ডাক্তার দেখাবার মুরোদ নেই, শুধু ধুলো ধুলো করে নাচলেই হল! বোনটাকে তো ঝি বানিয়ে ছেড়েছ!

প্রণব এত উসকানিও উপেক্ষা করল। আগে বিছানাটা ঝাড়তে হবে। সে ঘরে পরার ধুতি নিয়েও কখনও বিছানায় ওঠে না। খালি গায়ে, শুধু আন্ডারওয়্যার পরে শোয়াই তার অভ্যাস। দুটো হ্যাঁচকায় ধুতি খুলে ফেলে সে বিছানায় উঠল। হাঁটু মুড়ে ঘুরে ঘুরে দু-হাত দিয়ে বিছানার চাদর পরিষ্কার করতে করতে অনেকটা আপনমনে বলল, ঘুষখোর কুণ্ডুটা না মরলে আমার আর প্রমোশনের আশা নেই।

দু-হাতের পাতা ধুলোয় কিচকিচ করছে। গা শিরশির করে ওঠে। পাছে গায়ে লেগে যায়, হাত-দুটোকে সাবধানে তুলে ধরে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে প্রণব ফিরে দাঁড়াল, ডাক্তার দেখাচ্ছি না তো কী! ডাক্তারের কাছে আজ যাওনি তুমি?

— তুমি টাকা দিয়েছ? এই তিনবারের একবারও তুমি টাকা দিয়ে গিয়েছিলে আমায়?

রমা উল্টোদিকে মাথা দিয়ে বিছানায় ধপ করে শুয়ে পড়ে থরথর করে কেঁদে উঠল, বিনা পয়সায় দ্যাখে, পরীক্ষার ছুতো করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা—

কান্নায় খাটসুদ্ধু নড়তে থাকে।

প্রণব হাতের ধুলো ভুলে দৌড়ে এসে রমার পিঠে হাত রেখে একদম বোবা হয়ে থাকে। তার হাত রমার পিঠে ঝাঁকুনি খায়। ওইরকম বসে থেকে একসময় প্রণব তার ধুলোমাখা হাতের পাতায় মুখ ঢেকে ফস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

প্রথম প্রকাশ : আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯